হবে। তবে পরে—

সম্পাদনা

কুমারেশ ঘোষ

৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-৭০০০০৭

তীয় প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৫৭। তপতী ঘোষ কর্তৃক
হগৃহ ঃ ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড কলিকাতা-৫৪ থেকে
কাশিত এবং সৌরভ ঘোষ কর্তৃক ঐ ঠিকানায় মন্মথ-মুদ্রনী
কে মুদ্রিত।

সুসাহিত্যিক

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

এক বর অনেক কনে

সাগর নগর

নীল ঢেউ সাদা ফেনা

জল যৌবনা

বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস

ইংরেজের দেশে

নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস

সবুজ রাশিয়ায়

ইত্যাদি

নতুন মিছিল

কখনো মেঘ কখনো তারা

হাস্যকর গল্প

কলকাত্তা কলকাত্তাই

ম্যানিয়া

যম

হেলিকপটারখানা আলতো করে তার পা ছোঁয়ালো গৌরীশৃঙ্গ-সদন-এর বিরাট অট্টালিকার সুপ্রশস্ত ছাদে। তার পিঠের ঢাউস পাখাখানার স্পীড গেলো কমে। অটো-মেটিক সিঁড়ি নেমে এলো।

হেলিকপটার থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে নামলো কয়েকজন মেয়ে পুরুষ আর দীঘা।

হেলিকপটারের পাখা আবার স্পীড নিলো, উড়ে গেল গৌরীশৃঙ্গ-সদনের ছাদের হোল-ড্রপ থেকে এর পরের স্টপেজ মানালি-ম্যানসন। তারপর নামবে নন্দাঃ পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা-ম্যানসনে। তারপর ইণ্ডিয়া বা ইন্দ-এর কয়েকটা বড় বড় নগর টাচ করে চলে যাবে কাশ্মীরের আগে যাকে বলা হতো কাশ্মীর। হেলিকপটারটা আসচে আন্দা বা আন্দামান থেকে ক্যাল-এর কেরাকোরাম হিন্দুকুশ-ম্যানসন হয়ে।

এগুলি কলকাতার সব বড় বড় ম্যানসন।

কলকাতার এখন নতুন নাম ক্যাল। তবে অনেকে আদর করে বলে 'কলি'। 'কলি' কথাটা এসেচে প্রাচীন বাংলা ভাষা 'কলিকাতা' থেকে।

ক্যাল-এর এই ম্যানসনগুলো সত্যিই দেখবার মত।

এক-একটি যেন ছোটখাটো পর্বতপ্রমাণ সহর। কী নেই তাতে! U শেপ-এর অট্টালিকা। বিশতলা বাড়িতে মোট তিন হাজার ফ্ল্যাট। সিঙ্গলরুম, টু-রুম আর থ্রি-রুম ফ্ল্যাট সব। ওগুলির চলতি নাম একা, দোকা, তেকা। কেউ কেউ বলে মনো, ডাভস (Double থেকে বা Doves কপোত কপোতীদের জন্যে) এবং ফ্যাম (ফ্যামিলির সর্টকাট—যাদের একটি, বড় জোর দুটি ছেলেমেয়ে আছে, ফ্যামিলিম্যান)। সব ফ্ল্যাটগুলির সামনে পেছনে মাঝ-খানে লম্বা লম্বা করিডর। প্রতি একশো ফ্ল্যাটের জন্যে আছে একজন করে তরুণী সুপার-সুপারভাইজার। তরুণরা যেতে আসতে তাদের আদর করে, চুমু খায়, মিষ্টি করে ডাকে সুপারী, কেউ বলে প্যারী। তারাও প্রতি-আদর জানিয়ে বলে, নটি নাট (nut)।

কোন কিছুর জন্যে এই সব ম্যানসনের বাইরে যাবার দরকার নেই। কারণ, বিরাট বাজার আছে ম্যানসনেই। সেখানেই সব পাওয়া যায়। টিনে বা শিশিতে ভ্যাকুয়ম কিংবা প্লাসটিকের প্যাকেটে মোড়া নানারকমের খাবার। একেবারে রেডিমেড। ডিম সেদ্ধ, ডিমের কারি, মাছ-ঝাল, দই ইলিস, মাংসের কোর্মা, চিকেন-তন্দুরী, সিঙাড়া কচুরী, আবার ভাত, রুটি পরটা, গরম লুচি, খিচুড়ি, পোলাও, ফ্রাইড রাইস, ডাঁটা চচ্চড়ি, পুঁইশাক, মোচার ঘণ্ট, ঝিঙে পোস্ত, কড়াইয়ের ডাল, ছোলার ডাল, মুগের

ডাল, নানারকমের ভাজাভুজি, শুকতো, চাটনী, অম্বল, দই, ক্ষীর, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, এমন কি মিঠে পান —সব কিছু প্যাক করা পাওয়া যায়। শুধু ঐসব জিনিস সাজানো আলাদা অটোমেটিক মেসিনের বোতাম টিপলেই হলো। অবশ্য মেসিনের গায়ে লেখা দাম অনুযায়ী কয়েন ঢুকিয়ে দিতে হবে বটে। তবে ওসব জিনিস কি আর কেউ নিয়মিত খায়? নেহাত কোনদিন ইচ্ছে হলো সখ করে গেলো, গত বিংশ শতাব্দীর রান্না একটু আধটু চেখে দেখলো, যা তাদের পূর্বপুরুষরা কব্জি ডুবিয়ে খেয়েচে আর ভুঁড়ি বাগিয়েচে বা গায়ের চর্বি বাড়িয়েচে। ওসব খেতে গেলেও তো সময় লাগে, হাত ধুতে হয় বা মুছতে হয়, কাপ প্লেট ধুতে হয়। অত সময় কোথায়? ওর চাইতে ফুড ট্যাবলেট, ভিটামিন ট্যাবলেট, কারি ট্যাবলেট যা ইচ্ছে মুখে দাও, স্রেফ গলে যাবে মুখের মধ্যে অথচ টেষ্ট বা ফ্লেবার সব কিছুই পাবে। তবে এসব ট্যাবলেট অফিসের দিনে কাজের মধ্যে খাওয়া হয়। রাত্রের খাওয়াটা আসে কমিউনিটি কিচেন বা সমবায় রন্ধনশালা থেকেই।

ড্রেস ডিপার্টমেণ্টেও আছে লেটেস্ট ষ্টাইলের নানারকম পোশাক, জুতো ইত্যাদি। তবে সেসব আর সুতি, সিল্ক, নাইলন বা টেরিকটের নয়। জুতোও চামড়া বা রবারের নয়। ওসব র-মেটিরিয়াল বা কাঁচামাল এখন ইণ্ডাষ্ট্রিতে লাগচে। কাজেই পোষাকে বাজে নষ্ট করা হয় না।

পোষাক জুতো এখন এক রকম ওয়াকস পেপারে বা মোম লাগানো কাগজেই তৈরি হয়। দুদিন, বড় জোর তিন দিনের জন্যে পরো, পরে ইউটিলিটি-পট বা দরকারী সংগ্রহ-পাত্রে ফেলে দাও। সেগুলো চালান হয়ে যাবে পোষাক জুতোর ফ্যাকটরিতে। গলিয়ে তৈরি হবে আবার উইক-এণ্ড বা সপ্তাহান্তিক ফ্যাশানের পোষাক জুতো! দাম তো বেশি নয়, আর কাচাও যায় না। তাছাড়া কাচাকাচির ব্যাপারও নেই। আর পোষাকেও কোন বাড়াবাড়ি বা ভাবালুতা নেই। স্রেফ যেটুকু না হলে নয়, বা কাজকর্মে সুবিধে হয়—সেই মতই তৈরি করা। মেয়েরা বুকে আঁটে নানা রংয়ের আর ডিজাইনের কাঁচুলি আর পরে উরু-ঝুল স্কার্ট! পায়ে রঙীন পামস্থ, কাঁধে পোষাকের রং মিলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ। চুল তাদের ববড্ করা, চোখে কালো চশমা। পুরুষের পোষাকের ঝামেলাও গেচে কমে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জির মত জামা, রঙীন ছাপা, পরনে হাফ প্যাণ্ট, পায়ে কেডস্-এর মত জুতো বা ফুটউইয়ার বা ওয়াকার।

ঐ সব ম্যানসনে আছে সিনেমা হল, থিয়েটার হল, জলসা ঘর, ড্যান্সিংহল, হাসপাতাল, নার্সারী, সুইমিং পুল, ক্লাব, লাইব্রেরী, মিটিং হল, গ্যারেজ এবং আরো অনেক রকম ব্যবস্থা। ছাদে বিরাট পার্ক, জাপানী কায়দায় বাগান এবং হেলিকপটার ষ্টেশন বা হেলি-ড্রপ। হেলি-ড্রপের

কাছেই একটা ওপেন এয়ার-রেস্তোরাঁ। তাতে নানা রকমের অটোমেটিক মেসিনে আছে কফি চা, চকোলেট-ট্যাবলেট বা লিকুইড। প্লাসটিকের চেয়ার টেবিলগুলো চমৎকার করে সাজানো, টেবিলে ফুলদানীতে প্লাসটিকের ফুল। শোনা যাচ্চে সফট মিউজিক।

দীঘা হেলি থেকে নেমে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। তার ব্রা আর উরু-ঝুল স্কার্ট একই রঙের, হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটাও। ট্যাবলেট না নিয়ে লিকুইড নেবার অটোমেটিক মেসিনে কয়েন ফেলে এক বোতল চকোলেট দুধ নিলো সে। পরে চোখের গগল্সটা খুলে বসলো একটা চেয়ারে। আরো কয়েকজন মেয়ে পুরুষ রেস্তোরাঁয় বসে গুলতানি করচে। রেস্তোরাঁটার নাম, ইন্টারভ্যাল। রেস্তোরাঁর চার্জে দাঁড়িয়ে একটা রোবট।

দীঘা দেখলো, দূরে জাপানী গার্ডেনেও অনেকে বসে হাওয়া খাচ্চে, ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে প্রজাপতির মত।

দীঘা বেশ ধীরে ধীরেই চকো-মিল্ক সিপ করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি থাকলে সে কয়েকটা ঐ চকো-মিল্কের ট্যাবলেট খেয়ে চলে যেতো বা সঙ্গে নিতো। অবশ্য সেগুলোরও স্বাদ ঐ রকম, আর খেলে ঐ গরম লিকুইডের মতই শরীরটা গরম হতো।

দীঘার শরীরের গড়নটা বেশ দীঘল। বয়েস বাইশ। হাতের পায়ের গড়নও খুবই চমৎকার। উরু দুটি কলাগাছের মতোই মসৃণ। বক্ষযুগল যেন দুটি নৈবেদ্য। দীঘার জন্ম টেষ্টটিউবে নয়, স্বাভাবিক যৌনসংসর্গের ফলে। তার বাবা নাকি উত্তর-ইন্দ্-এর লোক, মা পূর্ব-ইন্দ্-এর ক্যাল-এর মেয়ে। সে মায়ের কাছে শুনেচে। ইন্দ্-এর ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মায়ের দেখা হয় কোন এক ম্যানসনের মার্কেটে এবং দুজনকেই দুজনের ভালো লাগে, আর তখনই তারা ঐ ম্যানসনেরই একটা লভ-রুম বুক করে কয়েক ঘণ্টা কাটায়। তার মায়ের গায়ের রংটা ছিলো শ্যামবর্ণা, তাই দীঘার গায়ের রংটাও কিছুটা চাপা। তা দীঘা কয়েক বছর হলো কমপ্লেকশন-ক্লিনিক বা গায়ের রং বদলাবার ক্লিনিকে গিয়ে নিজের গায়ের রং বদলে নিয়েচে। তবে খুব সাদাটে রংটা বেছে নেয়নি, লাইট অলিভ রংটাই পছন্দ করে নিয়েছিলো। মাত্র সাতদিনের ট্রিটমেণ্টেই কাজ হয়ে গেলো। একটি সুগন্ধী মলম লাগানো এবং দুবেলায় দুটো করে ট্যাবলেট খাওয়া, ব্যস্।

দীঘা দুধের পেপার বটল বা কাগজের বোতলটা শেষ করে উঠে পড়লো। রোবটটা তখন খটখট করে এসে হাতের স্পঞ্জ দিয়ে টেবিলটা মুছে ফেলে খালি পেপার বটলটা ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলো। পরে মাথাটা নীচু করে তাকে বিদায় জানালো। জানিয়ে আবার সে তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীঘা লক্ষ্য করে দেখলো রেস্তোরাঁর ঐ রোবটটা বেশ ভালোই। চলতে ফিরতে বেশি খটখট আওয়াজ করে না। গায়ের পোষাকও বেশ ঝকঝকে। মুখের মুখোসটায় হাসি হাসি ভাব।

দীঘা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে লিফট রুমে গেলো। সেখানে বেশ কয়েকটা লিফট ওঠা-নামা করচে। সব অটোমেটিক। অনেকেই আপ-লিফটে ছাদে উঠচে। অনেকেই ডাউন-লিফটে নীচে নামচে।

দীঘা একটা ডাউন-লিফট বা ক্যারিয়ার-এ ঢুকে বোতাম টিপলো এগারো তলার। ক্যারিয়ার সোঁসোঁ করে নীচেয় নামতে লাগলো। ক্যারিয়ারে ফোমচেয়ারে বসে সে রিফ্লেকটারে নিজের চেহারাটি একবার দেখে নিলো। হ্যাঁ, ফেস তার সম্পূর্ণ ফ্রেশ। ব্রা আর স্কার্টে বেশ স্মার্টই দেখাচ্চে। ক্যারিয়ার এগারো তলায় এসে থেমে গেলো। অটো-ডোর খুলে যেতেই দীঘা বেরিয়ে লম্বা করিডর দিয়ে এগিয়ে চললো ১০২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে। ওটা ডাভ।

দীঘা ১০২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াতেই ভেতরে একটা বাজিং আওয়াজ হতে লাগলো। আর ভেতরের দিকের দরজার ফটো-ফ্রেমে ফুটে উঠলো দীঘার মুখ।

টু-রুম ফ্ল্যাটে বা 'ডাভ'-এর বেডরুমে ফোম-বেড-এ শুয়েছিলো ডাইজাগ। ভেতরের দরজার ফটো-ফ্রেমে দীঘার

মুখের ছবি ফুটে উঠতেই ভাইজাগ শুয়ে-শুয়েই বললো, কী সৌভাগ্য, এসো-এসো। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাগনেটিক ভাইব্রেশনে দরজা অল্প একটু ফাঁক হলো। দীঘা ঘরে ঢুকতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

কী সৌভাগ্য আমার! এসো এসো।—ভাইজাগ বিছানায় উঠে বসলো।

এলাম তোমারই কাছে।—দীঘা হেসে বললো। পরে ভাইজাগের বিছানায় বসে তার কপালে একটা চুমু দিলো। বললো, তোমার পার্টনার কোথায়? ভেবেছিলাম তারও দেখা পাবো।

মাহুরা অফিসে গেচে। আসবে হয়তো এখুনি।

তা তুমি কী করছিলে?

আজ নাইট-ডিউটি ছিলো, তাই একটা ড্রিম-পিল খেয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।

কী ড্রিম-পিল খেয়েছিলে?

গার্ডেন-ড্রিম-পিল—ভাইজাগ বললো হেসে: চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে থেকে মনটা যেন হাঁফিয়ে গেছলো তাই আজ গার্ডেন-পিলটাই খেলাম।

কী স্বপ্ন দেখলে?

দেখলাম চমৎকার একটি ছায়াঘন বাগান। চার-দিকে ফুল আর ফুল। একটা আঁকা-বাঁকা খাল বয়ে চলেচে বাগানের ভেতর দিয়ে। তাতে পদ্মফুল ফুটে আছে,

রাজহাঁস আর রাজহংসীরা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। খালের ধারে ঘাসের কার্পেট পাতা। সেখানে খানিকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম আকাশের দিকে চেয়ে। এমন সময় একটি মেয়ে এসে আমার পাশে বসলো, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মিষ্টি গলায় গান গাইতে লাগলো। পরে নাচলোও সে।…এমন সময় তোমার আসার খবর পেলাম।

আহা, তোমার এমন মধুর স্বপ্নটা ভেঙে দিলাম!

কিন্তু তার চাইতে আরো মধুর বাস্তব যে আমার সামনে।—হেসে ভাইজাগ বললো: যাক, এখন আসচো কোথা থেকে?

কোথা থেকে আবার! আন্দা থেকে! আমার কর্মস্থল।

সত্যিই, আন্দা শুনেচি বেশ ভালো জায়গা। কতবার ইচ্ছে হয়েচে যাই, তা যাওয়া আর হয় না।

থাক, খুব হয়েচে। তোমার শুধু মুখেই ইচ্ছে। টান থাকলে নিশ্চয়ই যেতে।

ভাইজাগ দীঘাকে তার বুকে টেনে নিয়ে বললো, এই দেখো, টান আছে কিনা।

দীঘা বললো, এতটা পথ টেনে এলাম তাই ভদ্রতার খাতিরে একটু বুকে টানচো! পুরুষমানুষের ভালবাসা তো জানি।

যাক, তোমার সঙ্গে এখন ঝগড়া করবো না—ভাইজাগ কথার মোড় ফিরিয়ে দিলো : তুমি কিসে এলে ?

হেলিতে।—দীঘা বললো, একবার ভাবলাম হেলিতে সাগর ডিঙিয়ে ক্যাল-পোর্ট পর্যন্ত এসে বাকি পথটা টিউবে আসবো। তবে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ট্রেনের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করলো না। তাছাড়া মাথাটাও কেমন জ্যাম হয়েছিলো, তাই সোজা হেলিতে এসেই নামলাম তোমাদের হেলি-ড্রপে।

ভাইজাগ বললো, তা ভালোই করেচো।—দীঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো : এখন মাথাটা ছেড়েচে তো ?

হ্যাঁ, ড্রপে ইণ্টারভ্যাল-এ একটা নরম চকো-মিল্ক খেয়ে এখন ভালোই লাগচে।

একটা ড্রিংক হোক না ?

হতে পারে। জিন একটা। তবে জিন-ট্যাবলেট নয়। আজ যেন লিকুইডই খেতে ইচ্ছে হচ্চে। আছে ?

আছে। দিচ্চি।

না, না, তোমাকে আর উঠতে হবে না। আমিই নিচ্চি। ফ্রিজে আছে তো ?

হ্যাঁ।

দীঘা উঠে ফ্রিজ খুলে একটি গ্লাসে জিন সোডা মিশিয়ে নিলো নিজের জন্যে আর একটা গ্লাসে ভাইজাগের জন্যে মেশালো হুইস্কি সোডা।

ভাইজাগ ততক্ষণে উঠে এসে ফোম-সোফায় বসে পাইপ ধরিয়েচে।

দীঘা হুইস্কির গ্লাসটা ভাইজাগের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, জিনের গ্লাসটা নিয়ে বসলো এসে ভাইজগের কোলে। বাঁ হাতে ভাইজাগের গলাটা জড়িয়ে ধরে ডান হাতে নিজের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললো, বড় যে পাইপ টানচো? টোবাকো ট্যাবলেট নেই বুঝি? চাই? দেবো?

না।—ভাইজাগ হুইস্কি গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে পাইপটা একবার টেনে বললো, দেখো দীঘল, টোবাকো-ট্যাবলেট বা ঐ টক্সি ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে মুখটা যেন নষ্ট হয়ে গেচে। তাই মাঝে মাঝে পাইপ টানতে ভালোই লাগে। বইতে পড়েচি, আগেকার লোকেরা, মানে আমাদের পূর্বপুরুষরা বিংশ শতাব্দীতে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে বা চুরুট ধরিয়ে টানতো, পাইপও খেতো এই রকম। আর একমুখ ধোঁয়া ছাড়তো।

হাউ রোমাণ্টিক, তাই না?

হ্যাঁ।

ভাইজাগ বললো, যাক, এখন কী মনে করে এলে বলো শুনি?

দীঘা বললো, মাতুরাকে বলেচি ব্যাপারটা ফোটো-ফোনে।

তা আমাকে বলতে বাধা আছে কিছু?

কিছুমাত্র না।—দীঘা বললো, জানো তো আমার একটি টেস্ট-টিউব বেবী আছে, বয়েস বছর তিনেক। বেবীটি মেয়ে। কানাডিয়ান স্পারম আর আমার ওভামে তৈরী—বেবী বার্থ ক্লিনিকে। আমার পার্টনার খাজুরাহো ওকে খুবই ভালোবাসে, আমিও। আর জানো তো, খাজু এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করচে, বিশেষ করে ইন্দ-এর পূর্বাংশ নিয়ে। কয়েকদিন আগে সে আমাকে তার রিসার্চের একটা চ্যাপটার পড়ে শোনাচ্ছিলো। তাতে লিখেচে, আগে নাকি স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে ছেলে মেয়ে জন্মাতো। সেই সব যৌন-সঙ্গমের পাথুরে মূর্তি, পুরী, কোনারক, খাজুরাহের মন্দিরে আজও আছে। অবশ্য এখন যেমন ছেলে বা মেয়ে যা দরকার তা ইচ্ছেমতো কনট্রোল করা যায় তখন তা যেতো না। ছেলে বা মেয়ে হলে ওরা বলতো, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে, ভগবানের হাত। হাউ ফানি! তাই না?

ভাইজাগ বললো, হ্যাঁ। কারণ, তখনো সেক্স-সিলেকটিং সায়েন্সের এ ধরণের কোনো ডেভেলপমেণ্ট হয়নি।

যাইহোক—দীঘা বললো, জানো ভাই, খাজুর কাছে শুনলাম, সেকালে চাইল্ড-বার্থের সময় নাকি মেয়েদের গর্ভযন্ত্রণা হতো, মানে তলপেটে ব্যথা হতো, তাছাড়া দশমাস ধরে সেই বাচ্চাকে পেটে ক্যারি করতে হতো! হাউ লাভলি!

লাভলি ?—আশ্চর্য হলো ভাইজাগ: তুমি সেই পুরোন দিনের লেবার ভোগ করতে চাও নাকি ?

হ্যাঁ চাই, চাই, মাই ডার্লিং !—দীঘা ভাইজাগের গলা জড়িয়ে ধরলো: ঐ যে বেবী, ওকে আমার বেবী বলে মনেই হয় না, যদিও সে আমার ওভাতেই তৈরী। মনে হয়, এডপটেড—পুষ্যি। কিন্তু যদি সে আমার গর্ভে হতো, তাকে ক্যারি করতাম দশমাস ধরে, গর্ভ যন্ত্রণার মাধ্যমে জন্ম নিতো সে—তবে ওকে আমার মনে হতো—সেই পুরোন দিনের কথায়, নাড়ি ছেঁড়া ধন ! আর আমি তার মা।

হোয়াট ডু ইউ মীন ?—ভাইজাগ অবাক হলো: তুমি কী আবার সেই পুরোন যুগে ফিরে যেতে চাও ?

তা চাই না, তবে সেই অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেতে চাই।—দীঘা বললো, আগেকার মেয়েরা নাকি চাইল্ড বার্থের সময় লেবার পেইন ভোগ করলেও পরে তা ভুলে যেতো, আবার স্বামী-সঙ্গমে রাজী হতো। ভারতচন্দ্র—না কী যেন নাম বললো খাজু, বিদ্যাসুন্দর নামে তার একটা বইয়ে এই নিয়ে একটা কবিতাও লিখেচে। কবিতাটা বলেছিলো খাজু আমার মনে নেই। আর ঐ বিদ্যাসুন্দর বইয়ের গল্পও বলেছিলো সে। সুন্দর বলে একটা ছোকরা নাকি বিদ্যা বলে একটি রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত

হবে বলে মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটেছিলো। হাউ হরিবল্ তখন লভমেকিং-এ খুব কড়াকড়ি ছিলো, না?

হ্যাঁ।—ভাইজাগ বললো, তবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঐ কড়াকড়িটা অনেক কমে গেছলো শুনেচি। তখন মেয়ে পুরুষ সব একসঙ্গে কাজকর্ম, সভাসমিতি করতে শুরু করেচে।

তবে থাজু রিসার্চ করে জানতে পেরেচে, তখনকার দিনে মেয়েদের মাত্র একটি করে পুরুষ বাঁধা থাকতো, তাদের বলা হতো স্বামী। এজন্যে নাকি ফুলের মালা বদল হতো, পার্টি হতো, তাকে বলা হতো বিয়ে—বিবাহ। মেয়েটির যে পুরুষ আছে, অর্থাৎ কেউ যেন তার দিকে আর না ঘেঁসে, সেটা জানাবার জন্যে তারা তাদের সিঁথিতে একরকম লাল পাউডার পেণ্ট করতো। অর্থাৎ রেড সিগন্যাল। ট্রাফিক ক্লোজড। হাউ ফানি! না?

ভাইজাগ হেসে বললো, ভাগ্যিস ঐ যুগটা পার হয়ে এসেচি আমরা।

এমন সময় ঘরে ফটো-ফোনের বাজার বেজে উঠলো। দীঘা ভাইজাগের কোল থেকে নেমে ফোনের বোতামটা টিপতেই স্ক্রীনে ফুটে উঠলো মাদুরার মুখ। দেখতে বেশ মুখখানি। দীঘাকে দেখে মাদুরার মুখ হেসে বললো, হ্যালো দীঘি, তুই এসে গেচিস। কখন এলি?

দীঘা বললো, অনেকক্ষণ এসেচি। তোর পার্টনারের

কোলে বসে গল্প করছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু মাহু, তুই তো জানিস কেন এসেচি! ঐ সব সেকেণ্ড চাইল্ড বার্থ নিয়েই কথা হচ্ছিলো।

মাহুরার মুখ বললো, তুই গাভমেণ্ট থেকে চাইল্ড বার্থের পারমিট নিয়েছিস? হেলথ রিপোর্ট?

নিয়েচি।—দীঘা বললো, দুটো চাইল্ডের রেশন আমার। একটা টেস্টটিউব বেবী, আর এই সেকেণ্ড অ্যাণ্ড লাষ্টটা হবে ভায়া প্রেগনেন্সি। আর ঠিক করেচি, ডককে বলবো, টি. টি. বেবী আমার গার্ল, কাজেই পি. বেবী আমি মেল্ চাই—ছেলে! তা হ্যাঁরে, তুই যে এখনও ঝাড়া-হাত-পা!

ধ্যেৎ।—মাহুরার মুখ বললো, ওসব বেবী-ফেবী আমার ভালো লাগে না। বেশ আছি।—বলেই ভাই-জাগকে বললো, হ্যালো পার্টনার, দীঘির কথা শুনে তোমারও একটা বেবীর ইচ্ছে হয়েচে নাকি?

ভাইজাগ ফোম-সোফাতে বসেই হেসে বললো, সরি। মোটেই না।

মাহুরার মুখ দীঘাকে বললো, ভাই, আমি তো অফিসে আটকে গেচি। বস্ অফিসের কাজে এখুনি সুইস-এ যাবে, তার ইচ্ছে তাকে আমি কোম্পানি দিই। হি ইজ ফিলিং ভেরি লোনলি। করুণভাবে বস বললো আমাকে, দুদিন দুরাত্রির ব্যাপার তো। অ্যারো ফ্লাইটে (Arrow

flight) যাবো আর আসবো। তুমি যদি এই সময়টুকুর জন্যে আমার অ্যাকটিং পার্টনার হও, তবে খুবই খুশি হবো। অবশ্য এক্সট্রা দেবে বলেচে।—তুমি কী বলো ?

বেশ তো।—ভাইজাগ বললো।

দীঘা বললে, আর আমার যে তোকে নিয়ে প্রেগনেন্সি-হোমে যাবার কথা ছিলো ?

ছিল তো।—মাদুরার মুখ বললো, এদিকে দেখচিস তো, হঠাৎ আটকে গেলাম, ফ্ল্যাটেও যেতে পারচি না। ডোণ্ট মাইণ্ড, তুই এক কাজ কর্, ভাইকে নিয়ে চলে যা। —ভাইজাগকে বললো, ভাই, দীঘিকে একটু হেলপ করবে ? বেচারা আন্দা থেকে এলো, অথচ—

ভাইজাগ বললো হেসে, উইথ প্লেজার।

মাদুরার মুখ বললো দীঘাকে, ডোণ্ট মাইণ্ড। ভাই-কে দিয়ে যদি তোর প্রেগনেন্সির কাজটা হতো, তাতে আমি গ্ল্যাডলি এগ্রি করতাম। কিন্তু তাতো হবে না। আজকাল তো প্রায় মেলই অপরেটেড্। ভাই-ও। ও আমাকে ওর অপরেশন সার্টিফিকেট দেখাবার পর আমি ওর পার্টনার হতে রাজি হয়েছিলাম। এই যে বস-এর সঙ্গে যাচ্চি, ওর সার্টিফিকেটও দেখে নিয়েচি।—বলেই চোখ টিপে বললো, তবে যদি তুই একটু এনজয় করতে চাস—নো হার্ম। কী বলো পার্টনার ?

আই অ্যাম অলয়েজ রেডি।—ভাইজাগ হাসলো।

দীঘা হেসে বললো, সরি, ইচ্ছে নেই। তাছাড়া আমি এখন মা হতে চলেচি। রিয়েল মাদার। যাক, তুই যখন আসতেই পারলিনে, তখন আর দেরি করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে নিয়ে যেতে হবে।

ভাইজাগ বললো, ডালিং, সুইজারল্যাণ্ডে এখন খুব শীত, বৃষ্টিও পড়বে মাঝে-মাঝে। হীট-পিল (heat-pill) আর রেন-অফ-অয়েণ্ট (Rain off oint) সঙ্গে নিয়ো, নইলে কষ্ট পাবে।

মাহুরার মুখ বললো, ওসব বস-এর ভাবনা, আমার নয়। হ্যাঁ, তুমি যদি একলা ফিল করো, তবে কোন কলগার্লকে ডেকো। ম্যান্সনেই তো আছে, নৈনী, পুরী, কেরালা—। আচ্ছা চলি, বাই, বাই দীঘি, লাক্।

ফটো-ফোন অফ হয়ে গেলো।

ভাইজাগ ফোম-সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো: চলো তবে, আর দেরি করে লাভ নেই।

ভাইজাগের গায়ে এতক্ষণ শুধু পাতলা একটা নরম কাগজের ছাপা ড্রেসিং গাউন ছিলো। সে ওয়ার্ডরোব থেকে হাফপ্যাণ্টটা নিয়ে গাউনের মধ্যেই পরে নিলো, পরে গাউনটা খুলে একটা ছাপা স্যাণ্ডো গেঞ্জি মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে ওয়াকস্-পেপারের ওয়াকারে পা গলিয়ে দিলো।

দীঘা ভাইজাগকে একটা চুমু দিয়ে বললো, কষ্ট দিচ্চি।

কষ্ট!—ভাইজাগ হাসলো: আমি একজন ভাবী মাকে

নিয়ে যাচ্ছি, একী কম গর্বের কথা! আজকাল ক'টা মেয়ে এভাবে মা হতে চায়! তবে চলো, কমিউনিটি কিচেনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। একটু ভালো-মন্দ। ফুড-ট্যাবলেট খেয়ে দরকার নেই আজ।

চলো।

দুজনে ঘরের বাইরে এসে লম্বা করিডর পেরিয়ে আপ-লিকট-এ ঢুকলো। বোতাম টিপে দুজনে উঠে এলো পনেরো তলায়। সেখানে কমিউনিটি কিচেন। বিরাট হল। অনেক লম্বা লম্বা টেবিল পাতা, তার পাশে-পাশে ফোম-টুল। হলের একধারে রকম রকম খাবার ভর্তি এক-একটা অটোমেটিক মেসিন। মেসিনের কাঁচের শোকেশে খাবারের নমুনা দেখানো রয়েচে। এক পাশে দাম লেখা এবং কয়েন ফেলবার শ্লট।

ভাইজাগ একটা টেবিল থেকে গাদা-করা সগু-ধোয়া প্লেট আর চামচ নিয়ে এক-একটা মেসিনের কাছে এসে কয়েন দিয়ে বোতাম টিপে-টিপে স্যাণ্ডুইচ গরম প্যাটিজ আর টমেটো স্যুপ-এর বোতল নিয়ে দুজনে দুটো টুলে বসে গেলো। আরো অনেকেই খেতে বসেচে। খাওয়া হয়ে গেলেই রোবটরা নিঃশব্দে খালি প্লেটগুলো নিয়ে যাচ্ছে, স্পঞ্জ দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে ফেলচে। সত্যিই, চার-দিকে ঝকঝকে তকতকে। মেঝে মোম পালিশ করা।

সারা হলটা মৃদু আলোয় স্বল্প আলোকিত, প্লাসটিকের ফুল সাজানো এখানে ওখানে। একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসচে, কোথা থেকে বোঝা যাচ্চে না।

কিচেন থেকে বেরিয়ে ভাইজাগ বললো, চলো দীঘল, গ্যারেজ থেকে অটোখানা নিয়ে বেরুনো যাক।

চলো।—দীঘা বললো, ক্যাল-এর চেঞ্জ যদি কিছু ইতিমধ্যে হয়ে থাকে, সে সব দেখাও যাবে।

দুজনে ডাউন-লিফট-এ নেমে এলো গ্যারেজে।

বিরাট গ্যারেজ। সারি সারি দাঁড়ানো সব চকচকে গাড়ি। সুইচ বোর্ডে নিজের গাড়ির নম্বরের বোতামটা টিপতেই অটো বেরিয়ে এলো ওদের সামনে। গাড়ির দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল। এয়ারকণ্ডিশনড করা অটোর কোমসীটে বসতেই দরজা আপনা থেকেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা দেখতে আগেকার মোটর গাড়ির মতই অনেকটা, তবে প্লাসটিকের তৈরি, চলে এটমিক পাওয়ারে। পেট্রোল লাগে না। আর ষ্টিয়ারিং নেই, হাতে চালাতে হয় না, শুধু বলতে হয় কমপিউটারে, কোথায় যাবে, ব্যস —অটো আপনিই চলতে থাকে সাঁসাঁ করে। তারপর ঘরে সোফায় বসে গল্প করার মত নিশ্চিন্ত গল্প করো।

ভাইজাগ কম্পুটারের মাউথ পীসে বলে দিলো : এভিনিউ-দশ, ওয়ে-ত্রিশ, রো-উনিশ, নম্বর সাত-তিন-নয়। প্রেগনেন্সি হোম।

দীঘা ভাইজাগকে একটা স্মোক ট্যাবলেট দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরে গল্প করতে লাগলো। রবারাইজড মসৃণ রাস্তা দিয়ে বহু রং-বেরংয়ের অটো সাঁসাঁ করে চলেচে। বিরাট চওড়া রাস্তা। মাঝখানে রাস্তা ভাগ করা লম্বা ভুলেভার্ড। ফুল গাছে সাজানো। তাতে বহু সাদা রংয়ের চেয়ার পাতা। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁ। পার্কে ছেলে মেয়েরা খেলা করচে। ডাইনে বাঁয়ের রাস্তার মাঝখানের সবুজ সাজানো পার্কটা যেন কোন মেয়ের চুলের সিঁথি। পার্কটাও যেন তার দুপাশের রাস্তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেচে।

ফুটপাথ বা ওয়াক (walk)-ও আছে, তবে তা দুপাশের বাড়ির একতলাটা গাড়ি বারান্দার মত বাড়িয়ে সে সব তৈরি করা। অর্থাৎ ফুটপাথ সব দোতালায়। এদিকের ওয়াক থেকে ওদিকে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে ওভারব্রীজ, যাকে বলে লিংক। লিংক থেকে স্লাইডার আছে চলন্ত সিঁড়ির মত, নীচের রাস্তার মাঝখানে পার্কে নামবার জন্যে। ওয়াক দিয়েও বহু মেয়ে পুরুষ চলেচে। দোতলা ওয়াক-এর সঙ্গে লাগোয়া রয়েচে ফাস্ট-ওয়াক (fast walk) বা রান (Run), যাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার তারা ঐ রান ব্যবহার করে। পায়ে চাকা বা হুইল লাগানো ওয়াকার পরে হার্ড-রবার-রান দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে,

কোন আওয়াজ হয় না। ওয়াক আর রান-এর মাঝ-খানে মাঝখানে মার্কারি লাইট পোষ্ট, ফুলের টব, দরকারী জিনিসের অটোমেটিক মেসিন বসানো। কোন কোন বড় রাস্তায় বা এভিনিউতে একপাশে প্লাসটিকের বিরাট টিউবের মধ্যে কনভেয়ার বা ওয়াক-ওয়ে। তাতে দাঁড়ালেই হলো, আর হাঁটতে হবে না, সোজা চলতে থাকবে। অবশ্য এগুলি মেয়েরা বা বাচ্চারাই বেশি ব্যবহার করে।

ভাইজাগের অটো চলতে লাগলো। রাস্তায় কোথাও ট্রাফিক জ্যামের জন্যে ঠেক খাবার কারবার নেই। রাস্তার মোড়গুলোতে কখনো অটো অন্য রাস্তার তলা দিয়ে বা আণ্ডারওয়ে দিয়ে চলে যাচ্চে, কখনোবা কোন রাস্তার ওপর দিয়ে বা ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্চে। কমপিউটারের নির্দেশ মত এভিনিউ বা ওয়ে-র নম্বর হিসাবে অটো ডাইনে বাঁয়ে বেঁকচে।

কোথাও পুলিস নেই।

দীঘা কথায় কথায় বললো, জানো ভাইজাগ, খাজুর কাছে শুনেচি, আগেকার মানুষগুলো নিজেরা চলতে পারতো না, পুলিশেদের হাত দেখাতে হতো। চুরি চামারি খুন জখম খুব হতো, পুলিশ আসতো ঠেকাতে, অনেক সময় গুলিও চালাতো। হরিবল্! তাই না?

ভাইজাগ হাসলো: তার মানে, তখনকার লোকেরা না-বালক ছিলো, বর্বর ছিলো।

তারা নাকি কথায় কথায় সরকারী বাস-ট্রাম পোড়াতো। বুঝতো না, সেগুলো তাদেরই সম্পত্তি।

মানে, তারা অজ্ঞান ছিলো।

আরো শুনেছি, অনেক নাকি পার্টি ছিলো। তারা গদির লোভে মারপিট করতো, নিজেদের পকেট ভরাতো, দেশের ভালোর দিকে নজর দিতো না। এখন যেমন এখানে দুতিনটি পার্টি আছে, ভোটে যারা জেতে তারা দেশের ভালো কিছু করবার চেষ্টা করে, যাতে পরের বার আবার ভোট পায়, আর যারা হারে তারা সেটা স্পোর্টস-ম্যান স্পিরিটে মেনে নিয়ে দেশের ভালোর জন্তে জয়ী পার্টিকে সাহায্য করে—সে সব নাকি আগেকার লোকেরা ভাবতেই পারতো না। ভোটের সময় লিখে লিখে বাড়ির দেওয়াল নষ্ট করতো।

অর্থাৎ তারা বন্ত ছিলো। মানুষের বেশে ছিলো জানোয়ার।

আর জানো ভাইজাগ, খাজু সেযুগের যেসব ফটো সংগ্রহ করেছে, তা যদি ছাখো তবে স্রেফ মূর্ছা যাবে।

কী রকম ?

নর্থ-ক্যালে বা হাওড়া বলে একটা জায়গায় বহু খোলার চালের বস্তি ছিলো। তাতে লোকেরা গরু-ভেড়ার মত বাস করতো। অনেক রাস্তায় কাঁচা নর্দমা ছিলো। রাস্তায় ময়লা জমে থাকতো। একটু বৃষ্টি হলে অনেক

রাস্তা জলে ডুবে যেতো। ফটোগুলো সত্যিই খুব ইণ্টারেস্টিং। আস্তানায় এসো দেখাবো।

দেখবো।—ভাইজাগ বললো, তবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তখন লোকেরা খুব গরীব ছিলো। আর সহরে কোন মিউনিসিপ্যালটি ছিলো না। বা থাকলেও ট্যাক্সের টাকা চুরি করতো তারা।

একটু পরেই অটো ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে চললো।

ভাইজাগ বললো, ইংরেজ আমলে তাদের রানীর স্মৃতিতে এটা নাকি এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হয়। তাঁর নাম নাকি স্যার আর. এন. মুখার্জি। স্যার নাকি ইংরেজের দেওয়া খেতাব, আর মুখার্জি হচ্ছে বংশের পদবী। শুনেচি তখন সব পদবী ছিলো মুখার্জি চ্যাটার্জি, ঘোষ বোস বিশ্বাস—আরো সব কত কি?

দীঘা বললো, থাকবেই তো। জাতিভেদ ছিলো যে? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, স্বুবর্ণ বণিক অনেক রকম। এক জাতের ছেলের সঙ্গে অন্য জাতের মেয়ের নাকি বিয়ে হতো না। হলে খুব নিন্দে হতো। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অনেকেই এটা মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু বিয়েটা চালু ছিলো। হাউ ফানি! বিয়ে! স্ত্রী পুরুষে বাঁধাবাঁধি থাকবার নিয়ম। অবশ্য পরে নাকি ডেলহীর পার্লামেনটে ডিভোর্স বিল পাশ হয়েছিলো, পরে অ্যাবরশন বিলও। তবে ঐসব বিয়েতে

মেয়েরা কী সুন্দর সব শাড়ি পরতো। সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকতো তবে পেটের কাছটা খানিকটা খোলা রাখতো। কিন্তু ঐ রকম এক গাদা কাপড় নিয়ে তারা চলাফেরা করতো কী করে তাই ভাবি।

ও সব জানলে কোথেকে ?

ঐ যে খাজুর কাছে ফটো থেকে। ওর কাছে সে যুগের বিবাহ-পদ্ধতির অনেক ফটো আছে। ওর থিসিসে ঐ গুলো সব ব্যবহার করবে।

ভাইজাগ বললো হেসে : তার মানে তখনকার মেয়েরা ছিল রহস্যময়ী। তোমাদের মত ফুরিয়ে যায়নি।

মানে ?

মানে অতি সোজা। তোমরা শ্রীঅঙ্গের প্রায় সব কিছুই দেখাচ্চো। আর প্রায়ই কিছুই নেই দেখাবার !

বটে ! ইউ নটি !—দীঘা কনুই দিয়ে ধাক্কা দিলো ভাইজাগকে : আর জানো ভাই, ঐ ফটোতে দেখেচি, তোমাদের পোষাক ছিলো অদ্ভুত। তাকে ধুতি পাঞ্জাবি বলা হতো। ধুতিটা কোঁচানো থাকতো, পায়ে লুটোতো। পাঞ্জাবি বলে জামাটায়ও অনেক ঝুল ছিলো, ঐ সব ধড়া-চুড়ো পরে পুরুষরা কাজ করতো কি করে ?

ভাইজাগ বললো, শুনেচি, অনেক আগে জমিদারী প্রথা ছিলো। প্রজারা খাজনা দিতো আর ঐ সব জমিদাররা

বসে খেতো আর নবাবী করতো। কাজ করতে হতো না।

অটো এসে থেমে গেলো প্রেগনেন্সি হোমের 'কার-কীপ' (car keep)-এ।

বিরাট বাড়ি। বিশতলা। ভাইজাগ আর দীঘা অটো থেকে বেরিয়ে আপ-লিফটে দশ তলায় উঠে গেলো। সামনেই বিরাট প্লাসটিকের দরজা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াতেই মেঝেয় পায়ের চাপে স্প্রিংঅ্যাকসনে দরজার দুটো পাল্লা দু'ধারে সরে গিয়ে ওদের ঢোকবার পথ করে দিলো। ওরা ঢুকতেই দরজার পাল্লা দুটো নিঃশব্দে আবার মুখে-মুখে ভিড়ে গেলো।

ভেতরে মস্ত হলে ফোম-সোফা সাজানো। চারিদিক ঝকঝক তকতক করচে পরিষ্কার। নীল রংয়ের নরম আলোয় সারা হলটা রহস্যময়। প্লাসটিক পেন্টেড দেওয়ালে স্বাস্থ্যবান পুরুষদের বহু ছবি সাঁটা। নরম স্বরে ভেসে আসচে প্রেম সঙ্গীত। সোফায় অনেক যুবতী অপেক্ষা করচে। ঢিলে হয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সচিত্র পত্রিকার পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখচে। অনেকে রোবটের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্চে বাইরে করিডরে। কয়েকজন পুরুষ বসে আছে সোফায়। হয়তো তারাও কোন মেয়ের সঙ্গে এসেচে।

ঢোকবার দরজার পাশেই 'ওয়েলকাম' ডেস্ক। সেখানে

একটি রোবট দাঁড়িয়ে। ভাইজাগ আর দীঘা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই রোবট একখানা ফর্ম দিয়ে দেখিয়ে দিলো— অটো-টাইপাব। সেটা একটা ছোট কাঁচের ঘরের মধ্যে বসানো। সামনে ফোম-চেয়ার। ভাইজাগ পাশেই একটা ফোম-সোফাতে বসলো। দীঘা ঢুকে গেলো ছোট কাঁচের ঘরের মধ্যে। ফর্মখানা অটো-টাইপারের রবার রোলারের মধ্যে দিতেই তার কানে এলো মেয়েলী গলায় কে যেন বলচে, সামনের চেয়ারে বসো, বলো তোমার বিবরণ আর ইচ্ছা।

দীঘা সামনের ফোম-চেয়ারে বসে প্রশ্নের উত্তরে তার নাম ধাম বয়েস, কোন সন্তান আছে কি না, রোগ আছে কি না, ওল্ড-টাইম প্রেগনেন্সি চাও কেন, ছেলে না মেয়ে দরকার, কোথায় কাজ করো, দশমাস বেবী ক্যারী করবার মতো সময় সুযোগ আছে কি না, পার্টনার আছে কিনা, (পার্টনারের মত আছে কি না জিগ্যেস করলো না সেই কণ্ঠস্বর) এবং শেষ জিগ্যেস করলো, পারমিট আর হেলথ সার্টিফিকেট আছে কিনা।

দীঘা বললো, হ্যাঁ।

(কণ্ঠস্বর) পাশের স্লটে ঢুকিয়ে দাও।

পারমিট আর হেলথ সার্টিফিকেট ব্যাগ থেকে বার করে অটো-টাইপার মেসিনের গায়ে একটা স্লটে ঢুকিয়ে দিলো সে।

(কণ্ঠস্বর) এবার পাশের বুথে।

দীঘা প্রথম বুথ বা কাঁচের ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বুথে গেলো। সেখানে ঢুকতেই শুনতে পেলো আর একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর: সামনের বাক্সে ফি জমা দাও।

বাক্সের গায়ে চার্জ লেখা ছিলো এবং দীঘা তার এক বান্ধবীর কাছে জেনেওছিলো, আর সেই মত একখানা চেক সে লিখে এনেছিলো। চেকখানা দীঘা ফী-বক্সে দিতেই তার সামনে একটা ট্রে বেরিয়ে এলো। তাতে সুন্দর একখানি এলবাম এবং নানা রকম পুরুষের ছবি।

কণ্ঠস্বর কানে এলো: যে পুরুষকে পছন্দ করো, তার নম্বর মনে রেখে পাশের বুথে এলবাম জমা দাও।

দীঘা এলবামটা নিয়ে সোজা চলে এলো ভাইজাগের কাছে, ফোম-সোফায় বসলো তার পাশে।

এলবাম খুলে ভাইজাগকে দেখিয়ে বললো দীঘা, ভাই, ত্যাখো তো, কোন্ পুরুষকে পছন্দ করা যায়?

ভাইজাগ হেসে বললো, এতো কঠিন পরীক্ষায় ফেললে। কোন মেয়েকে পছন্দ করতে বললে তবু না হয় চেষ্টা করে দেখা যেতো। কিন্তু পুরুষ পছন্দ করা, সে তো তুমিই পারবে ভালো।

না, না, ইয়াকি করো না এখন। আমার জীবনে এ একটা মস্ত বড় সমস্যা।—দীঘা বললো, সেই জন্যেই তো

মাদুরাকে সঙ্গে আনবো ভেবেছিলাম। যাক, তুমি দেখো ভালো করে।

বেশ।—

দুজনে এলবাম উল্টে উল্টে পুরুষের নানা ভঙ্গীর রঙীন ছবি দেখতে লাগলো। সব সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষের ফটো। পাশে লেখা বিস্তৃত বিবরণ। কোন দেশীয়। ইন্দ-এর হলে উত্তর, দক্ষিণ বা পুব পশ্চিম—কোন অঞ্চলের, বিদেশীয় হলে ইয়োরোপা, ম্যারিকানা, রাশিয়ানা, আফ্রিকানা বা এসিয়ানা—তাও লেখা। তাছাড়া বয়েস কত, উচ্চতা কত, বুকের ছাতির মাপ কত, এবং গায়ের রংয়ের শেডও এলবামের ছবিতে বোঝা যাচ্চে, যদিও গায়ের রংটা খুব বড় কথা নয়, কারণ শেড-ট্রিটমেণ্টের কল্যাণে এখন আর কারোর কমপ্লেকসন কমপ্লেক্স নেই।

দীঘা একটা ফটো মন দিয়ে দেখে ভাইজাগকে জিগ্যেস করলো, এ পুরুষটা কেমন?

ভালোই তো দেখচি।

ঠিক তো?

ঠিক।

ফটোর পাতায় লেখা আছে রুম নম্বর ৩৫। দীঘা এলবাম বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইজাগকে বললো, বসো আমি আসচি।

এসো। আমি ততক্ষণ রেষ্ট-রুমে গিয়ে বসছি।—ভাইজাগ উঠলো।

আচ্ছা।—দীঘা চলে গেলো এলবাম ফেরত দেবার বুথের কাছে। সেখানে ট্রেতে এলবামটা রেখে দিতেই, তার পাশে দাঁড়ানো রোবটটা উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ বেরুলো : নম্বর?

হাতে তার অটো টাইপারের কার্ডখানা।

দীঘা বললো, পঁয়ত্রিশ।

রোবট মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে হাত নাড়িয়ে ইশারা করলো, এসো।

দীঘা তার পাশে পাশে চললো। হল পার হয়ে লম্বা করিডরে পৌঁছুলো তারা। করিডরের পাশে পাশে সব ঘর বন্ধ, দরজায় নম্বর সাঁটা। পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেলো। দীঘা ঢুকে গেলো ভেতরে, রোবটের কাছ থেকে কার্ডখানা নিয়ে।

হ্যাঁ, ঠিক ফটোর মতোই দেখতে পুরুষটি। ইয়োরোপা পুরুষ। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলবর্ণ, ড্রেসিং গাউন পরা

ঘরটা চমৎকার করে সাজানো। সোফা, বিরাট পালংক, ফ্রীজ, টেলিভিসন, ফুলদানিতে ফুল, মেঝেয় মোটা ফোম কার্পেট পাতা। ঘরের দেওয়ালে গোলাপী রংয়ের আসবাবপত্র, চাদর পর্দা ইত্যাদি সব ঐ একই রংয়ের।

ঘরে আবছা গোলাপী আলো, মৃদু সুগন্ধ। সব মিলিয়ে রহস্যময় সুন্দর পরিবেশ। দেওয়ালে একদিকে সুন্দর ফুলের মতো দেখতে একটি শিশুর ছবি। হাসচে। স্বর্গীয় হাসি।

পুরুষটি এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে দীঘার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো। তাকে ফোম-সোফায় পাশে বসিয়ে নিজে পাশে বসলো। সামনের টিপয় থেকে কফি-ট্যাবলেট নিয়ে তাকে খেতে দিলো। পরে ড্রিংক টক্সি-ট্যাবলেট। এবং পরে তার কোমর জড়িয়ে ধরে হাসির ও মজার মজার গল্প করতে লাগলো।

যদিও পুরুষটি ইয়োরোপা তবু গল্প করার ভাষার কোন বাধা ছিলো না, ওয়ার্লড ল্যাংগোয়েজ বা ওয়ারল্যাং ভাষা আজ সারা বিশ্বে চালু। ইন্দ-এও।

পরে এক সময় ঘরের আবছা আলোটাও ধীরেধীরে নিভিয়ে অন্ধকার আরো গাঢ় করে দিলো পুরুষটি। স্নইচ টিপে দিলো টেলিভিসনের। টেলিভিসনে ফুটে উঠলো নারী-পুরুষের যৌনমিলনের উত্তেজনাপূর্ণ চলচ্চিত্র। অতি যৌন-স্বাধীনতায় যৌন-আবেগ বা আকর্ষণ গেচে কমে। তাই ঐ ব্যবস্থা।

খানিক পরেই যখন তারা নগ্ন অবস্থায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, তখন টেলিভিসনে ফুটে উঠলো সুন্দর সুন্দর শিশুর মুখ, ফুটে উঠলো মা তার গর্ভের সন্তানকে বুকে

নিয়ে কেমন আদর করচে। আর কেবলই শোনা যেতে লাগলো নীচু গলায় মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠস্বর: তোমাদের মিলন শুভ হোক, তোমাদের সন্তান সুন্দর হোক, স্বাস্থ্যবান হোক, দীর্ঘায়ু হোক।

ভাইজাগ রেষ্ট রুমে একটা ফোম-সোফায় বসে তখন একখানা সচিত্র পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলো। আরো কয়েকজন মেয়েপুরুষ সেখানে ছিলো। তারা কেউ টেলিভিশন দেখচে, কেউবা খুব নীচু গলায় গল্প করচে।

ভাইজাগ একমনেই সচিত্র পত্রিকাখানা ওল্টাচ্ছিলো। পাতায় পাতায় সব রঙীন ছবি। নানা ঘটনার ছবি, নতুন নতুন আবিষ্কারের ছবি, দেশ-বিদেশের ছবি, শুধু ছবি আর ছবি। লেখা খুব কম, ছবির তলায় যেটুকু লেখা। বেশি লেখা কেউ আর পড়তে চায় না।

ভাইজাগের হাসি পেলো। আগে নাকি সব বড় বড় উপন্যাস লেখা হতো, মোটা মোটা। তার এক বন্ধুর ঠাকুর্দার বাবার একখানা বই দেখেছিলো সে। দেখে আঁতকে উঠেছিলো। পাতায় পাতায় শুধু ছাপা। আর সেইসব নাকি লোকে পড়তো। লোকদের খুব সময় ছিলো বোধহয় কিংবা বেকার ছিলো।

ভাইজাগ ভাবলো, ঐ সব টাইপ-এর হাত থেকে খুব

বাঁচা গেচে। এখন যেসব সাহিত্য হিসেবে বেরোয় সেগুলি দু'চার লাইনের কবিতা বা আধপাতার গল্প। ইঙ্গিতময় নাটক, বাজে কথার গ্যাঁজানি নেই। আর উপন্যাস টেলিভিসনেই ছবি করে দেখানো হয়। তাছাড়া লংপ্লেইং রেকর্ডেও ছোট ছোট উপন্যাস গল্প বেরিয়েচে প্রচুর।

আর আছে থ্রি-ডাইমেনসন চলচ্চিত্র। সেই সঙ্গে স্মেলোভিসন, তাতে কোন সুগন্ধ থাকলে তা নাকে আসবে। রঙ্গমঞ্চে ছোট ছোট একাংকিকা। পুরোন দিনের সমাজ-ব্যবস্থা দেখাবার জন্যে পুরোন উপন্যাস বা গল্পকেও নাট্যরূপ বা চিত্ররূপ দিয়ে দেখানো হয় ষ্টেজে বা স্ক্রীনে। সেযুগের কবি রবিরও কয়েকখানা বইয়ের নাট্যরূপ ভাইজাগ দেখেচে, মন্দ না।

ভাই।

ডাক শুনে পত্রিকা থেকে মুখ তুলে ভাইজাগ দেখলো, দরজার কাছে দীঘা।

ভাইজাগ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে: ফিনিসড ?

হ্যাঁ। চলো।—হাসি মুখে বললো দীঘা: এবার সত্যিকারের মা হবো। হাউ থ্রিলিং!

ভাইজাগ বললো, নিশ্চয়ই। তবে আমি তোমার এ ছেলের ধর্মবাপ হলাম। মানে, তোমার ঐ মাতৃত্বের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গী হয়েচি তো ?

নিশ্চয়ই। —দীঘা খুব খুশি।

ভালোকথা, ছেলে চেয়েছিলে তো? তা মেল্-হরমোন ট্যাবলেট খেয়েছিলে তো?—ভাইজাগ জিগ্যেস করলো।

দীঘা বললো, হ্যাঁ। পুরুষটি আমার কার্ড দেখে মেল-হরমোন ট্যাবলেট দিয়েছিলো খেতে।

যাক, এখন তুমি কী করবে, কোনদিকে যাবে?—ভাইজাগ জিগ্যেস করলো।

দীঘা বললো, আমাকে এখন নাকি রেষ্ট নিতে হবে স্লিপিং রুমে। তারপর ছুটি। তখন দু এক জায়গায় দেখা সাক্ষাৎ করে আন্দায় ফিরে যাবো। তুমি?

ভাইজাগ বললো, ফ্ল্যাটে গিয়ে স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে আবার ফ্ল্যাট হয়ে ঘুম। আজ নাইট ডিউটি আছে।

তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম।

আর আমাকে যে ধর্মবাপ হবার সুযোগ দিলে? বাই, লাক্।

লাক্।—দুজনে হ্যাণ্ডশেক করলো: একদিন মাদুরাকে নিয়ে এসো।

চেষ্টা করবো। লাক্।

ভাইজাগ তার অটো নিয়ে চলে গেলো ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। দীঘা প্রেগনেন্সি হোমের স্লিপিং রুমে চলে গেলো বিশ্রামের জন্যে, ঘুমের জন্যে।

আণ্ডার-ওয়াটারে বিরাট ম্যানসন প্রবাল-প্রাসাদ-এর একটি চার রুমের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে রিফ্লেকটারের সামনে বসে চিলকা প্রসাধনে ব্যস্ত।

অনেক বছর আগে যেখানে সুন্দরবন ছিলো, সেসব জায়গায় এখন গড়ে উঠেচে সুন্দর সহর। সেখানকার সাপ কুমীর হরিণ বাঘেরা নানা সহরের এনিম্যাল হোমে বহাল তবিয়তে দর্শনীয় হয়ে আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষকদের বা গাইডদের সঙ্গে দলে দলে আসে তাদের বিষয়ে ষ্টাডি করতে, তাদের ছবি আঁকতে।

ঐ একদা সুন্দরবন যেখানে বে-অব-বেঙ্গল-এর সমুদ্রের তীরে এসে শেষ হয়েচে, নতুন সহরগুলো কিন্তু সেখানেই শেষ হয়নি থেমে যায়নি। নেমে গেচে সমুদ্রের তলায়। সেখানে ডাঙ্গার কিনারায় জলের তলায় তৈরি হয়েচে পাশাপাশি বিরাট সব ম্যানসন—ওয়াটার টাইট, ভেতরে এয়ারকণ্ডিসন করা। এক ম্যানসন থেকে অন্য ম্যানসনে যাবার প্লাস্টিক-টিউবওয়ে রয়েচে—তার মধ্যে ক্রমাগত চলচে কনভেয়ার। তার উপরে দাঁড়ালেই হলো, না-হেঁটে চলে যাওয়া যায় অপর ম্যানসনে। স্বচ্ছ প্লাসটিকের টিউবের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে দেখা যায় কত রকমের মাছ, সামুদ্রিক জীব, সী-উইড, ছোট পাহাড়, শেওলা,—সে এক বিচিত্র স্বপ্নপুরী। ম্যানসনগুলির বাইরের দেওয়ালও তৈরি পুরু স্বচ্ছ প্লাসটিকের শীটের—যাতে সেখান

থেকেও দেখা যায় ঐ জাতীয় সমুদ্রের তলার রহস্যময় দৃশ্যাবলী। শুধু তাই নয়, মনে হয়, সমুদ্রের মধ্যেরই বাসিন্দা তারা। রাত্রে জলের মধ্যে জ্বলতে থাকে নানারঙের মারকারি ভেপার ল্যাম্প এবং ম্যানসনের চারদিকে তখন এক মোহময় শ্যামল শোভার সৃষ্টি হয়।

তবে এই সব আণ্ডার-সী বা আণ্ডার-ওয়াটার ম্যানসনে ধনীরাই থাকতে পারে। এগুলির ফ্ল্যাট চার্জ ল্যাণ্ড ম্যানসনের চার্জের চাইতে অনেক বেশি।

চিলকার পার্টনার গোয়া গতকাল হঠাৎ বিশেষ কাজে সুইস-এ গেচে ইয়োরোপায়। অবশ্য ফটো-ফোনে বলে গেচে দুদিন বাদেই ফিরবে। আর সঙ্গে তার শ্যাডো (shadow) মাদুরা—আগেকার দিনে যাকে সেক্রেটারি বলা হতো। মাদুরা যাওয়ায় ভালোই হয়েচে, গোয়া লোনলি ফিল করবে না।

চিলকার বয়েস চল্লিশের ওপর। কিন্তু দেখায় যেন—বিশ বছরের যুবতী। তার কারণ আছে বৈকি। সে নিয়মিত গ্ল্যাণ্ডের নির্যাসে তৈরি ইয়ুথ ট্যাবলেট খায়, ভাইব্রেটারে মেসাজ করায়, রাত্রে শোবার আগে স্কীন-ক্রীম ব্যবহার করে, চুলগুলো এক-এক বছরে এক-এক রকম রংয়ের শেডে ব্লীচ করায়। তাছাড়া ফ্যাশান-প্যারেডে গিয়ে ড্রেসের যখন যে নতুন ডিজাইন দেখে তখনি সে

ড্রেসারের কাছে ছোটে, তৈরি করায় হাল ফ্যাশানের ব্রা, স্কার্ট, ফুটওয়ার, উইয়ার বা ওয়াকার। চিলকা কার কাছে যেন শুনেচে, ওয়াকারকে সেকালে নাকি বলা হতো শু, স্লীপার! স্লীপার মানে? স্লীপার পরে কি স্লীপ খেয়ে পড়ে যেতো?

চিলকার দেহ যেমন বয়েসের বাধা মানেনি, তেমনি তার মনটাও। মন তার তারুণ্যে ভরা। সবুজ চঞ্চল—প্রাণ চঞ্চল। মাঝে চিলকার মনটা কিছুদিন ধরে কেন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো, কোন কিছুই ভালো লাগতো না, কিছুতে উৎসাহ পেতো না। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। দেহে ভরা যৌবন অথচ মনটা যেন যোগিনী। মানায় কখনো? আবার বার্ধক্যে মানসিক চাঞ্চল্যও দৃষ্টিকটু।

চিলকা তাই বলেছিলো গোয়াকে, গোয়া, এ তো বড় মুস্কিল হলো! দেহ যা চায় মন তা চায় না। হয়তো তুমি যা চাও, আমি তা দিতে পারি না। আমাকে ছেড়ে পার্টনার নিতে চাও? অনেকেই তো আসে—লুধিয়ানা, এলিকান্টা, কেরালা, আলমোড়া—। বেশ হাসিখুসি ওরা—

শুনে গোয়া হেসেছিলো। চিলকার গাল টিপে দিয়ে বলেছিলো, হাসালে আমাকে চিলকা। তুমি দেখচি সেকেলে বৌদের মত বলচো। তাদের গর্ভে ছেলে না হলে

তারা নাকি তাদের স্বামীদের বলতো—তারপর গোয়া সুর করে বলেছিলো—ওগো প্রিয়তম, তুমি আর একটি মহিলাকে বিবাহ করো এবং তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করো এবং আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও। হোয়াট ননসেন্স!

বলেই আশ্চর্যের ভাব দেখিয়ে গোয়া বলেছিলো, আচ্ছা চিলকা, তুমি কি ভুলে গেলে, এদেশে হার্ট ক্লিনিকের ব্যবস্থা আছে। আজই চলো সেখানে, বদলে ফেলো তোমার ওল্ড হার্ট, মরচে পড়া হার্ট। চলো।

তখনি গেছলো তারা হরতনী আকারের বিরাট বাড়ি, হার্ট এক্সচেঞ্জে। অভিনব হার্ট ব্যাংকে রয়েচে নানা ধরণের হার্ট—নানা বয়েসের পুরুষ আর নারীর হার্ট। তাছাড়া প্লাসটিক হার্টও আছে, তার চার্জ কম। হার্ট-এক্সচেঞ্জ বা হার্ট-এক্স-এ যে শুধু হার্টের রোগী বা রোগিনীরাই আসে, তা নয়। আসে যাদের হার্ট নার্ভাস, সহজে ভয় পায়। আসে যাদের হার্ট দুঃখে ভরা বা হতাশায় ভরা—আর আসে তারা যারা হার্ট এক্সচেঞ্জে বা হৃদয় বিনিময়ে অসুবিধে বোধ করচে, মনের মিল হচ্চে না কিছুতেই। তখন তারা হার্ট-এক্স-এ গিয়ে বদলে নেয় একই গ্রুপের হার্ট। কিংবা হার্ট এক্স-এর এক্স-রেষ্ট-এ শুয়ে কম্পুটারে যে নির্দেশ পাওয়া যায় সেইমত হার্ট বদলায়। এমনও দেখা গেচে, একটা ছেলে বা মেয়ের হার্ট মিলচে না, এ-ওকে বুঝতে পারচে না, কেবল ভুল বুঝচে, তাই মন কষাকষি হচ্চে। তখন আর

তারা দেরি না করে চলে যায় হার্ট-এক্স-এ এবং এক্স-রেষ্ট-এ কম্পুটারের নির্দেশে এক্সপার্ট-এর সাহায্যে ছেলেটির হার্ট মেয়েটিতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয় আর মেয়েটির হার্ট ট্রান্স-প্ল্যান্ট করা হয় ছেলেটিতে। আধঘণ্টার ব্যাপার। একটু রেষ্ট তারপরেই সব সমস্যার সমাধান। হৃদয়ের বা হার্টের বিনিময় হওয়ায় ছেলেটি তখন বুঝতে পারে মেয়েটির হৃদয়ের কথা বা মনের কথা, আর মেয়েটিও পারে ছেলেটির মনের কথা জানতে। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাসিমুখে বেরিয়ে যায় হার্ট-এক্স থেকে।

গোয়া যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেছিলো তখন ও-ও একবার গেছলো ইয়ুথ ক্লিনিকে। কোল্ড ষ্টোরেজে রাখা একসিডেণ্টে মরা এক যুবকের কিডনি, ষ্টমাক আর মেল-অরগ্যান বদলে নিয়েছিলো সে।

একটি বিশ-বাইশ বছরের তরুণীর প্রাণচঞ্চল হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েচে চিলকার মুসড়ে পড়া হার্টের বদলে। তাই চিলকা এখন মনে-প্রাণে হতে পেরেচে কাঁচা আর সবুজ। পৃথিবীকে তাই সে আবার রঙীন দেখচে, তার চোখে সব পুরুষকেই লাগচে ভালো—তা বয়েসে সে তার চাইতে ছোটই হোক বা বড়ই হোক।

দেহেমনে তরুণী চল্লিশ-বছুরী চিলকার তাই অসহ বোধ হচ্ছিলো গতকালের রাত্রিটা। কাছে গোয়া নেই,

তাই কাল রাত্রে কাছে ডেকেছিলো বিশ বছরের কল-বয় ম্যারিনকে। তাকে দিয়েই পূর্ণ করেছিলো তার বিরহ-রাত্রি। গোয়া-ই ম্যারিন-এর সঙ্গে চিলকার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো, বলে দিয়েছিলো দরকার হলে ওকে ডেকো। বেশ ভালো ছেলে।

সকালে একটু আগে ম্যারিন ব্রেকফাষ্ট খেয়ে চলে গেচে। চিলকা বসেচে রিফ্লেক্টারের সামনে প্রসাধন করতে। বেরবে সে তার দশ বছরের ছোট ছেলে কার্সিয়ংকে দেখতে। সে থাকে ষ্টুডেণ্ট হোমে।

ছাত্রজীবনে ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে থাকে ষ্টুডেণ্ট হোমে। শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রী আছেন, যাদের গাইড বলা হয়। প্রতি পঁচিশজন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একজন করে গাইড। তাঁদের উপরেই ওদের মানুষ করবার ভার। অমানুষ হলে দায়ী হতে হয় গাইডদের। গাইডরা সবাই রীতিমত শিক্ষিত এবং মাইনে তাঁদের অনেক বেশি। সমাজে স্থানও তাঁদের সম্মানীয়। ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরাই তো প্রকৃত জাতীয় সম্পত্তি। তাই তাদের তেমনি করেই গড়ে তোলা হয়। সেজন্যে গভর্ণমেণ্ট খরচ করতে কোন রকম কার্পণ্য করে না।

নির্জন এলাকায় সুসজ্জিত পার্কের মাঝখানে এই সব ষ্টুডেণ্ট হোম। বিরাট অট্টালিকাগুলি নানা বিষয়ের

মডেলে আর ছবিতে যেন এক-একটি প্রদর্শনী। ঐগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখলে, যা বই পড়ে বোঝা যায় না তাও অতি সহজেই বোধগম্য হয়। তাছাড়া আছে নিজস্ব টেলিভিসন, ষ্টেজ-স্ক্রীন, শিক্ষাদানের জন্যে। পুঁথিগত বিদ্যা এখানে অচল। সব চোখে দেখে বা নিজে হাতে করে শেখে। তাছাড়া গাইডরা প্রতি মাসে এক-একটি দ্রষ্টব্য স্থানে নিয়ে যান। সেখানে খোলা হাওয়ায় কদিন থেকে তাদের শিক্ষা দেন।

আর একটি স্থায়ী প্রদর্শনী আছে—সেখানে সব ছাত্র-ছাত্রীকে অন্তত তিন মাস গিয়ে থাকতে হয় গাইডদের সঙ্গে। নগরের ধারে দশ বর্গ মাইল ধরে সেই প্রদর্শনী। তাতে ইন্দ-এর তো বটেই—সারা বিশ্বের দ্রষ্টব্যস্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন, সেখানকার কৃষি ও শিল্প পরিচয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যের নমুনা, বাসিন্দাদের জাতীয় পোষাক পরা সে দেশেরই মেয়ে-পুরুষ—সব কিছু সেখানে। এক একটি ছোট-খাটো দেশ যেন বসানো রয়েছে পাশাপাশি। ছাত্র ছাত্রীরা গাইডের সঙ্গে দিনের পর দিন সেগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে, নোট করে এবং পরীক্ষায় পরে উত্তর দিতে হয়।

পরীক্ষা ঐ সব গাইডরাই করেন এবং সার্টিফিকেট দেন। সেই সঙ্গে গুড-কনডাকট ও এটিকেট—অর্থাৎ তাদের ভালো ব্যবহার ও ভদ্র আচরণের সার্টিফিকেট পেতে হয়। নইলে কাজেকর্মে বা সমাজে কোথাও তার স্থান

হয় না। পরীক্ষা লিখে হয় না। কারণ, স্টুডেন্ট হোমের কর্তৃপক্ষরা সেকালের লিখে পরীক্ষার কেলেংকারী ও টোকা-টুকির কথা সেকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেখে এটুকু বুঝেচেন যে ঐ ধরনের পরীক্ষা একটা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই ছিলো না। তাই প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে একটি বিশেষ সময়ে কম্পুটারের সামনে বসে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মার্কশীট বেরিয়ে আসে একটা ট্রেতে।

চিলকা স্টুডেন্ট হোমে কার্শিয়িংকে দেখতে বেরুতে যাবে এমন সময় ফটো-ফোনে বাজিং-এর আওয়াজ হলো। চিলকা রিফ্লেক্টারের সামনে থেকে উঠে ফটো-ফোনের সুইচ টিপতেই ফুটে উঠলো তার বাবার মুখ। পাতিয়ালা।

পাতিয়ালা চিলকার সাক্ষাৎ বাপ। সাক্ষাৎ বাপ মানে চিলকা জন্মেই তার নিজের ঐ বাপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলো। কারণ ঐ বাপ আর মায়ের যৌন-সংসর্গের ফলেই তার জন্ম হয়েচে। আজকাল ক্লিনিকে স্পার্ম আর ওভাম নকল ওভারি বা গর্ভাশয়ে প্রয়োগ করে সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্চে এবং যে স্পার্ম বা ওভাম দিয়েচে সে ঐ সন্তানকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করচে। কয়েক বছর আগেও টেস্ট-টিউব বেবী করা হয়েচে, অর্থাৎ কোন নারীর ইচ্ছামত

অন্য পুরুষের স্পার্ম তার জরায়ুতে প্রয়োগ করে তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা হয়েচে। তাতে সন্তান মাকেই চিনতে পেরেচে, বাপকে নয়। এই যেমন চিলকার ছোট ছেলে কার্সিয়ং বা বড় ছেলে শিলং। ওদের মধ্যে বড় ছেলে শিলং হয়েচে চিলকার গর্ভে অন্য পুরুষের স্পার্ম প্রয়োগে এবং কার্সিয়ং হয়েচে ক্লিনিকে চিলকার ওভামে ও অন্য এক এশিয়ানা পুরুষের স্পার্মে। সন্তান-নিরোধে অস্বাস্থিত গোয়া ওদের মায়ের পার্টনার বলেই নামে মাত্র বাপ।

কিন্তু পাতিয়ালা চিলকার যাকে বলে সাক্ষাৎ বাপ। চিলকার মা মারা গেচেন অনেকদিন। পাতিয়ালা সেই থেকে আর নির্দিষ্ট কোন পার্টনারীর সঙ্গে ঘর করেননি, ইচ্ছেমত পার্টনারী বদলে-বদলে কাটিয়েচেন এ পর্যন্ত। তার কারণ তিনি স্থিরভাবে এক জায়গায় কোথাও কাটাননি তারপর থেকে। ইঞ্জিনীয়ার তিনি। সরকারী কাজে ম্যারিকানা রাশিয়ানা ইয়োরোপা আফ্রিকানা এশিয়ানা সর্বত্র তাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েচে। তাছাড়া ম্যারিকানার অনুরোধে ইন্দ-এর সরকার তাঁকে লোন দিয়েচেন বেশ কয়েকবার চন্দ্রলোকে যাবার জন্যে। সেখানে ম্যারিকানা ও রাশিয়ানার কলোনী গড়ে উঠচে। পাতিয়ালা সেখানে এয়ার-প্রেসেসড্ বাড়ি করেচেন কয়েকটি। ভালো-ভালো হোটেলও তৈরি হয়েচে।

ধনীরা মুনে যাচ্চে হনিমুন করতে। সত্যিকারের হনিমুন। স্পেস-রকেটে চাঁদে যেতে সময় লাগচে দুদিন মাত্র।

ফটো-ফোনে পাতিয়ালার মুখ হেসে বললো চিলকাকে: চিলকি, কাল আমার ষাট বছর পূর্ণ হচ্চে।

এঁ্যা। তাই নাকি?—চমকে উঠলো চিলকা: হাঁ্যা, হাঁ্যা, তাই তো। কালই তো তোমার—

শেষ দিন।—পাতিয়ালার মুখ হাসলো। বললো, আসবে নাকি শেষ দেখা করতে?

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বাবা।—চিলকার দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো।

ওদিকে ফটো-ফোনে মুছে গেলো পাতিয়ালার মুখ।

চিলকা চোখের জল মুছে তখুনি ফটো-ফোনে ডাকলো তার বড় ছেলে শিলংকে। শিলং থাকে তার এক পার্টনারীর সঙ্গে। আলাদা। একটু পরেই ছবি ফুটে উঠলো শিলংদের ক্লাবের। শিলং ঐ 'আরাম হারাম' ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী বা জেনারেল। ছবিতে দেখা গেলো শিলং আরো কয়েকটি ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে হৈ-হৈ করচে, পাগলের মত এলোপাথাড়ি নাচ্চে আর বেতালা গান গাইচে। সকলেই প্রায় উলঙ্গ। মেয়েদের বুকে ব্রা-টুকুরও আর বালাই নেই। বাঁধন-খোলা সুগোল স্তনগুলোও লাফাচ্চে। সকলের চুলগুলো বড় বড়

জটপাকানো এবং ছেলেদের একমুখ করে দাড়ি। আর গায়ে মাথায় ধুলো-বালি।

শিলং।—চিলকা ফটো-ফোনে ডাকতেই শিলং ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো তার মা।

মা। কী ব্যাপার?—শিলং জিগ্যেস করলো।

যাক, বহু পুরোন পবিত্র 'মা' ডাকটা অচল হয়নি তাহলে!

চিলকা বললো, তোমাদের দাদুর কাল ষাট বছর পূর্ণ হচ্চে। তিনি পাস-হোম-এ যাচ্চেন। আমার ইচ্ছে, তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করো।

নিশ্চয়ই। বিশেষ করে তুমি যখন বলচো।

স্টুডেণ্ট হোমে গুড-কনডাকট এটিকেটের শিক্ষা পেয়ে ছেলে-মেয়েরা আর যাই করুক, অন্যকে সম্মান দিতে জানে, বাপ-মায়ের কথার অবাধ্য হয় না। শিলং যেতে রাজী হলো। চিলকা বললো, আমি খুশি।

ফটো-ফোনের সুইচ অফ করে দিলো চিলকা।

আর দেরি করলো না সে।

সোজা আপ-লিফটে উঠে এলো প্রবাল প্রাসাদের টপ ফ্লোরে। সেখানে গ্যারেজ থেকে তার এটোমিক অটোতে টিউব প্যাসেজ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে এলো ল্যাণ্ডে। পরে কয়েকটা এভিনিউ ওয়ে আর রো পার হয়ে সোজা গেলো সে কার্শিয়ংয়ের স্টুডেণ্ট হোমে। সেখানে হেড-

গাইডকে বলে কার্সিয়ংকে নিয়ে অটো-কম্পুটারে নির্দেশ দিলো তার বাবার মানালী ম্যানসনে যাবার জন্যে।

অটোতে বসেই চিলকা কার্সিয়ংকে তার দাদুর কথা বলতে কার্সিয়ং জিগ্যেস করলো, ষাট বছর বয়েস হয়ে গেলে মানুষকে বুঝি এভাবে চলে যেতে হবে? এ নিয়ম কেন মা?

চিলকা বললো, নইলে অনেক লোকসংখ্যা বেড়ে যাবে, তাতে অনেক অসুবিধে।

কার্সিয়ংকে নিয়ে চিলকা মানালী ম্যানসনে পাতিয়ালার ফ্লাটে আসবার একটু পরেই সেখানে এলো শিলং। অবশ্য হাফপ্যাণ্ট পরে এবং একটা ছেঁড়া ময়লা স্যাণ্ডো-গেঞ্জি গায়ে চড়িয়ে। গায়ে ধুলো-বালি। অথচ কেউ কিছু জিগ্যেস করলো না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা।

পাতিয়ালা তাদেরকে টক্সি-ট্যাবলেট ও ফুড-ট্যাবলেট দিয়ে বললেন, তোমরা এসেচো। আমি খুব খুশি। তোমরা সব ভাল আছো তো?

হ্যাঁ।—তিনজনেই বললো।

পাতিয়ালা ছোট নাতি কার্সিয়ংকে জিগ্যেস করলেন, হোমে কেমন এগুচ্চো?

কার্সিয়ং বললো, ভালোই।

আর তোমাদের ক্লাব? তোমাদের আরাম-

হারাম আইডিয়া?—জিগ্যেস করলেন বড় নাতি শিলংকে।

শিলং বললো, আমাদের আরাম-হারাম ক্লাবে আরো সভ্য-সভ্যা হয়েচে। প্রতিদিনই বাড়চে। আমরা রিসার্চ করে পেয়েচি, ইন্দ-এ প্রায় একশো বছর আগে জওহরলাল নামে একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আরাম হারাম হ্যায়।

শিলং আরো বললো, আমাদের বক্তব্য হচ্চে, আজকের দিনের এই আরাম হারাম। এত সুখ বিলাসিতা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলচে। এই রকম যান্ত্রিকসভ্যতার কল্যাণে এই সব-পেয়েচির দেশে আমরা স্বাভাবিক জীবন থেকে অনেক অনেক সরে গেচি। মাটির সঙ্গে আর আমাদের যোগ নেই। আমাদের খাদ্য আর মাটিতে হয় না। সব-সিনথেটিক ফুড। গাছপালার শ্যামলশ্রী কোথায়? আমরা মাটির ঘাসের স্পর্শ পাবার জন্যে সখ করে খাই আর্থ-ট্যাবলেট বা গ্র্যাস-ট্যাবলেট। এই অতি-বিলাসিতা, সুখ আর সব-পাওয়ার বিরুদ্ধে সেযুগেও একটা আন্দোলন ম্যারিকানাতেও হয়েছিলো। যারা করেছিলো, তাদের হিপি বলা হতো।

পাতিয়ালা সব শুনে শুধু বললেন, তোমাদের ঐ আইডিয়া যদি আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল হয়, তবে

প্রার্থনা করি তোমরা সফল হও।—তারপর চিলকাকে বললেন, চিলকি, গোয়া কোথায় ?

সে ইয়োরোপায় গেচে অফিসের কাজে—তার স্যাডো একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বোধহয় কাল ফিরবে।

চিলকার কথার উত্তরে পাতিয়ালা, বললেন তাহলে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

চিলকা করুণ স্বরে বললো, তোমাকে কালই যেতে হবে বাবা ?

হেসে বললেন পাতিয়ালা: তাছাড়া উপায় নেই। আমার লিমিট (Limit)-এর নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েচি পাস-হোমে। আর দেরি করা মানে তো তারপর থেকে প্রতিদিন মোটা টাকার পেনালটি দেওয়া। যাক, তোমরা সুখে থাকো শান্তিতে থাকো, এই কামনা করি।

পাতিয়ালা মেয়েকে ও দুই নাতিকে স্নেহ চুম্বন দিয়ে বললেন, কালই তো আমাকে নিতে আসবে পাস-হোম থেকে আর সেখানে তো তোমাদের যাবার নিয়ম নেই, তাই আজই খবরটা দিলাম।

চিলকা বললো, দুদিন আগে খবরটা দিলে তোমার কাছে এসে থাকতে পারতাম।

দিইনি ইচ্ছে করেই।—পাতিয়ালা হাসলেন, এ জগত

থেকে আমার বিদায়ের খবরে তো তোমরা দুঃখই পেতে। কাজেই অযথা তোমাদের দুঃখটা বাড়াই কেন?

তারপর সকলে মিলে গল্প-সল্প হলো যেন তেমন কিছুই ঘটচে না।—

পরে শিলং তার ক্লাবে চলে গেলো। বলে গেলো, কাল আমাদের প্রপাগাণ্ডা-প্রসেসন বেরুবে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যাই।

একটু পরে চিলকাও কার্সিয়ংকে নিয়ে চলে গেলো। আর পাতিয়ালা ঘরের টেলি-মিউজিকের সুইচটা অন্ করে দিয়ে আর একটা টক্সি-ট্যাবলেট মুখে ফেললেন।

পরদিন পাস-হোম থেকে একখানা অটো এসে পাতিয়ালাকে নিয়ে গেলো। পাস-হোমের পরিবেশ অতি শান্ত। দেখলে মনে হয় ষাট বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্লাব বুঝি। বিরাট সুসজ্জিত লাউঞ্জে তাঁরা হাসি-গল্প করচেন, যা দরকার চাওয়ামাত্র পাচ্চেন। অনেকে মায়া কাটাবার জন্যে এবং এই বিদায়-ব্যবস্থাকে সহনীয় করবার জন্যে কয়েক মাস আগে থেকেই এখানে আছেন। কয়েকজন বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় তাদের ষাট বছর পূর্ণ হয়ে গেলেও কয়েকদিন পরে এসেচেন, অবশ্য পেনালটিও

দিয়েচেন সেজন্যে। লাউঞ্জে আবছা আলো। আর কানে আসচে একটি মিষ্টি সুর—করুণ নয়। আর মাঝে মাঝে একটা গম্ভীর অথচ মৃদু পুরুষের কণ্ঠস্বর: প্রিয় দেশ-প্রেমিক-প্রেমিকা, আপনারা দেশকে ভালোবাসেন, দেশ-বাসীকে ভালোবাসেন। তাই আপনারা আপনাদের কনিষ্ঠদের পথ আটকে না রেখে, তাদের বঞ্চিত না করে তাদের সুযোগ দেবার জন্যে এবং দেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, স্বেচ্ছায় এ জগত থেকে বিদায় নিচ্চেন বলে দেশ ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা বীর, আপনারা নমস্য। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

পাতিয়ালার বিদায়ের পালা এলে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি সুন্দর সাজানো ঘরে। ফোমের ইজিচেয়ারে পাতিয়ালা বসলেন। সাদা পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে সেই ঘরে এলেন। 'পাসার' তিনি। এসে পাতিয়ালার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। অবশ্য জিগ্যেস করলেন, তাঁর কোন শেষ ইচ্ছে আছে কিনা? উত্তরে পাতিয়ালা হেসে বললেন, মানুষের ইচ্ছার শেষ আছে নাকি? না, আমি আমার ইচ্ছাকে এখানে আসবার আগেই শেষ করে এসেচি। তখন পাসার কলিং বেল টিপতেই একটি সাদা পোষাকে নার্স

ঢুকলো ঘরে। হাতে তার একখানি প্লেটের উপর ক্রিষ্টাল কৌটোয় 'ডেথ-পিল'। পাতিয়ালার সামনে সেটি ধরতেই—পাতিয়ালা পাসারের সঙ্গে গল্প করতে করতেই সেটি নিয়ে চুষতে লাগলেন। চকোলেটের মতই সুগন্ধী, আর মিষ্টি খেতে।

ক্রমে পাতিয়ালার দুচোখে নেমে এলো আবছা অন্ধকার। শেষে আরো গাঢ় হয়ে গেলো সে অন্ধকার। পাতিয়ালা চোখ বুজলেন।

পাসার পালস দেখে যখন বুঝলেন পাতিয়ালা মারা গেচেন, তখন আবার কলিং বেল টিপতেই স্ট্রেচারে করে পাতিয়ালার দেহটাকে নিয়ে যাওয়া হলো ইউটিলিটি-রুমের টেবিলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পেশালিষ্টরা এসে তাঁর চোখ দুটো অপারেশন করে বার করে নিলো। বার করে নিলো তার হৃদপিণ্ডটা, কিডনিটা। একজন এসে তাঁর মাথার চুল কামিয়ে নিলো, হাতের পায়ের নখগুলো নিলো কেটে। পরে দেহখানাকে অন্য আর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে সেপারেটার মেসিনে ঢুকিয়ে দিতেই অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে এলো পাতিয়ালার কংকালখানা। সেটা দরকার ডাক্তারি শেখবার জন্যে বা গুঁড়ো হাড়ের জন্যে। চুল দরকার টাক মাথা লোকদের মাথায় ট্রানসপ্লান্ট করবার জন্যে, চোখ আর হৃদপিণ্ড আর কিডনিও দরকার ঐ

জন্মেই। আর নখ দরকার ইণ্ডাস্ট্রীতে কারখানায়। তাছাড়া ঐগুলি রপ্তানিও হয় বিদেশী বাজারে। তাছাড়া মেদ মাংস, শিরা-উপশিরাগুলোও লাগচে ইণ্ডাস্ট্রীতে, কেমিক্যাল প্ল্যান্টে।

শিলংদের আরাম হারাম ক্লাবের প্রপাগাণ্ডা প্রসেসন সাত নম্বর এভিনিউয়ের মাঝখানে একটা বড় পার্কে এসে থামলো। দুটো লাঠির মাথায় সাদা প্ল্যাসটিকের শীটে লাল ফ্লোরেসেণ্ট পেণ্টে লেখা ফেষ্টুন। তাতে লেখা 'আরাম-হারাম'।

ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা সবাই প্রায় উলঙ্গ। গায়ে ধুলো মাটি লাগানো। সকলেরই খালি পা। পার্কে লোকের ভিড় জমতে লাগলো। তবে সে ভিড়ে ঠেলাঠেলি নেই হৈ-হল্লা নেই।

শিলং একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করলো—

আরাম-হারাম।

সবাই চীৎকার করলো, আরাম-হারাম।

এত সুখ চাই না।

চাই না।

পঙ্গু হতে চাই না।

চাই না।

তারপর শিলং শুরু করলো তার ভাষণ—

সিটিজেনস্! আজ আমরা এই আরাম হারাম-এর সভ্য সভ্যাবৃন্দ আপনাদের কাছে এক অভিনব প্রস্তাব পেশ করছি। আমরা মানুষরা জীবনে সুখ, চাই, শান্তি চাই স্বস্তি চাই ঠিকই, কিন্তু তা যখন অতিমাত্রায় এসে পড়ে তখন আর তার মাধুর্য থাকে না। দুঃখ না থাকলে সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না। রাত না থাকলে দিনের যেমন দাম নেই, এও তেমনি। বেশি মিষ্টি মুখে ভালো লাগে না। তেমনি বেশি সুখ বা বিলাসিতা অসহ্য। তাছাড়া আমরা স্বাভাবিক জীবন থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেচি। মাটির সঙ্গে আমাদের আর কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের অভাব নেই, অনটন নেই, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ব্যথা নেই, বেদনা নেই—

ঐ ভিড়ে সেখানে উপস্থিত ছিলো দীঘা। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে চীৎকার করে বললো—

এমন কি, আমরা মেয়েরা—গর্ভ-যন্ত্রণাটুকুও ভুলে গেচি। আমরা সন্তান পেতে চাই, কিন্তু তা ফাঁকি দিয়ে। সেজন্যে গর্ভ-যন্ত্রণাটুকুও ভোগ করতে চাইনে। তাই সন্তানকে নিজের সন্তান বলেই

মনে করতে পারিনে, নিজেকে মা বলেও ভাবতে পারিনে।

সঙ্গে-সঙ্গে উপস্থিত কয়েকটি মেয়ে বলে উঠলো, ঠিক, ঠিক। ঠিক কথা।

দীঘা সরে দাঁড়ালো। শিলং আবার বলতে লাগলো, উনি মেয়েদের মনের কথা বললেন। সেজন্যে ওঁকে ধন্যবাদ জানাই। অতএব সিটিজেনস্, আপনারা বুঝতেই পারছেন, অনেকেই আমাদের এই আদর্শের সঙ্গে একমত। আসুন, আমরা দুঃখ বরণ করি, মাসে একদিন করে উপোস করি, খিদের জ্বালা বুঝি। আসুন, আমরা হাঁটি, অটো না থাকার অসুবিধা বুঝি। আসুন, আমরা হিটি-ট্যাবলেট না খেয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপি, বুঝি শীতের কষ্ট কেমন। আমরা সঙ্গসুখ থেকে কয়েকদিনের জন্য বিরত হই, ভোগ করি বিরহ। এবং উনি যা বললেন, মেয়েরা ভোগ করুন গর্ভ-যন্ত্রণাও—। তবে তো আমরা সুখের স্বাদ পাবো। একশো বছর আগে এই বিলাসিতার বিরুদ্ধে য়্যামেরিকানায় গড়ে উঠেছিলো—হিপি আন্দোলন। কিন্তু তখন বহুদেশে খাদ্য সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ছিলো। তাই সে আন্দোলন লোকে ভালো চোখে দেখেনি। এখন আমরা সে যুগ থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আরো শুনুন। পুরাকালে ঋষিরা বনে থেকেই পেয়েছিলেন সুখ-শান্তির স্বাদ।

তাইতো পরবর্তী কালে কবি-রবি সেই অরণ্য শান্তির কথা ভেবেই লিখেছিলেন—ফিরে দাও সে অরণ্য···

এমন সময় দীঘা দেখতে পেলো ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মাতুরা ! আর তার পাশে একজন পুরুষ— বোধহয় তার সেই বস্।

তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এলো ভিড়ের বাইরে। কাছে এসে বললো, মাতুরা, তুই এখানে ? কখন এলি ?

এই মাত্র।—মাতুরা বললো, সুইস থেকে এয়ারপোর্টে এসে পাশেই হেলি-ড্রপে নেমে পথে ভিড় দেখে এলাম ব্যাপারটা কী দেখতে। এসে দেখি, যে ছেলেটা ভাষণ দিচ্চে, ও আমারই এই বস-এর ছেলে—

মাতুরা তার বস গোয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। পরে জিগ্যেস করলো, প্রেগনেন্সি হোয়ে গেছলি ?

হ্যাঁ, তোর পার্টনারকে নিয়ে।—দীঘা বললো, আমিও ভিড় দেখে থেমে গিয়ে ছোট্ট একটু বক্তব্যও জানিয়ে দিলাম গর্ভ-যন্ত্রণার বিষয়ে—

তাই নাকি ?

গোয়া এতক্ষণ শিলংয়ের ভাষণ শুনছিলো। হেসে বললো, নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা আর এগুতে ভয় পাচ্চে, তাই ব্যাক করতে চায়।

দীঘা হেসে উত্তর দিলো, ভয় নয়। ওরাই তো ভরসা। ওরা দুঃখ দৈন্যের মাধ্যমে সুখের স্বাদ চায়। সেই হিন্দুধর্মের মতে ত্যাগেই ভোগ। তাই চায় পরিবর্তন, নিয়মের অনিয়ম।

মাদুরা হেসে বসকে বললো, জানো, দীঘা একটি ইনতেলেকচুয়াল।

গোয়া হেসে চোখ টিপে বললো, আর দেখতেও বেশ!

—*—